এই সময়
সংবাদপত্র

ক থা স রি ৎ

পৃথিবীর সকল সম্পত্তিতে পৃথিবীর সকল মানুষের অধিকার সমান।
— ভ্লাদিমির লেনিন

অ-রাজনৈতিক

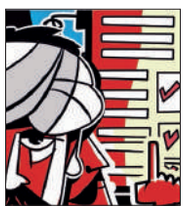

সবল গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক নাগরিকের অংশগ্রহণ। ভারতে জনসমাজের অন্তত একটি অংশে তারই বিপরীত প্রবণতা লক্ষণীয়। সে উদ্বেগই গত শনিবার নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে প্রতিভাত। তারা বলেছে, সিমলা থেকে সুরাট, সর্বত্রই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শহুরে ভোটারদের অনীহা অব্যাহত। এই প্রবণতাটি পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত। হিমাচল প্রদেশের ভোটদানের যা হার, সে রাজ্যের রাজধানীতে হার তার থেকে ১০ শতাংশ বিন্দু কম। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বেও গ্রামাঞ্চলে ভোটদানের হার শহরের তুলনায় অনেকতা বেশি। বস্তুত গুজরাটের শহরগুলিতে ভোটদানের হার ২০১৭-র তুলনায় কম। এই প্রবণতাটি যেমন নতুন নয়, তেমনই আবার 'স্বাভাবিক'ও নয়। গত তিন দশকে শহর আর গ্রামের মধ্যে এই ফারাক যেমন বেড়েছে, তেমনই আটের দশকের আগে এই প্রবণতা তেমন প্রকট ছিল না। অনুমান অসঙ্গত নয়, শহরাঞ্চলে পৌর প্রশাসনের গুণমানের অবনতির সঙ্গে এই 'অনীহা' সম্পর্কযুক্ত। যদিও শহরাঞ্চল থেকেই ভারতের জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশ আসে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পৌর সংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে।

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে গ্রামসমাজের সঙ্গে রাজনীতির আদানপ্রদানটি অনেক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সেখানে এখনও যূথবদ্ধতার প্রচলন আছে এবং ফলে রাষ্ট্র যখন ব্যর্থ হয়, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য এগিয়ে আসতে হয় রাজনীতিবিদদের। এটি শহরাঞ্চলে তুলনামূলক দরিদ্র এলাকাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে কারণে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের তুলনায় শহুরে নিম্নবর্গের ভোটদানের হার বেশি। আসলে গরিব মানুষদের এখনও দাবিদাওয়া পূরণের জন্য রাজনীতির প্রয়োজন হয়। উচ্চবর্গ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে দিনাতিপাতকেই শ্রেয় বলে মনে করে। এটিও উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় নির্বাচনে যখন বৃহত্তর সমস্যাগুলি আলোচনার কেন্দ্রে আসে, যা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির চর্চার বিষয়, সেখানেও একই প্রবণতা পরিলক্ষিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অ-রাজনৈতিক হয়ে ওঠা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য খুব একটা সুসংবাদ নয়। দৈনন্দিনের রুটি-রুজির বাইরে যে দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের প্রশ্নগুলি, যেখানে রাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করা প্রয়োজন, সেখানে শিক্ষিত শ্রেণির অনীহা গভীরতর সংকটের জন্ম দিতে পারে।

ক্রোধ

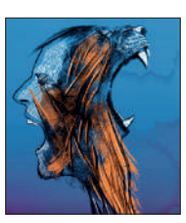

ক্রোধ এক অর্থে যুক্তিগ্রাহ্য আবেগ বটে, তবে তার কতখানি যুক্তির নিয়মে চলে, সে বিষয়ে তর্ক উঠতেই পারে। সময় এবং অবস্থা অনুযায়ী এক একজন অগ্নিশর্মা চোখ রাঙিয়েই রেহাই দিলেও, কোথাও হাতাহাতি রক্তারক্তিতেও পর্যবসিত হতে পারে। উগ্রচণ্ড মগজে সামান্য 'অন্যায়'-এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তা প্রশমিত করার উপায়ই বা কী, তা নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যেও বাদানুবাদ কম নয়। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পর রাগের চরিত্রগত বদল ঘটেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদে তার উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন এবং অবদমিত শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়াস, তার শৈল্পিক প্রকাশ এবং ভাঙন রোধ করে গড়ে তুলবার ক্ষমতা আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী একাধিক স্বর সৃষ্টির মাধ্যমে সভ্যতার প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার লক্ষণও বটে। তবু মাঝে মধ্যে সামান্য বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটলে তা মিটিয়ে নেওয়ার বদলে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সংবাদে সন্দেহ জাগে এই সভ্যতা জীবনের মূল্য বলতে ঠিক কী বোঝে। সম্প্রতি ছাগলে ফসলে মুখ দিলে তার জের টেনে বিবাদ এবং শেষে এক ব্যক্তির প্রাণহানির ঘটনায় মুর্শিদাবাদে একটি গ্রামটির আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাগলে কতখানি শস্য খেয়েছে এবং তার দাম মানুষের জীবনের চাইতে বেশি কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা এই ক্রোধোন্মত্ত মানুষরা কষে রেখেছিলেন কিনা সেটি জরুরি প্রশ্ন।

অ সং খ্যা

৩৭৮৪৬৫৮

(সাঁইত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার ছ'শো আটান্ন) — ২০১৭ সালে হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে যত ভোট পড়েছিল। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দি ন কে দি ন

৭ ডিসেম্বর

১৯২৮: নোয়াম চমস্কি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট', 'হু রুলস্ দ্য ওয়ার্ল্ড', 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার' ইত্যাদি।

১৯৪১: জাপানি বোমারু বিমান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণ করার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বিশ্বমায়া

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

বো ধি বৃ ক্ষ

পতঞ্জলির মতে, 'ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ'। যে সত্তা ক্লেশ-কর্ম-বিপাক ও আশয়ের দ্বারা উপহত হন না, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, আমরা এখানে ঈশ্বর বলতে বিশ্ব-চরাচরের অধীশ্বর, জীবের পরম ধ্যেয় পরমপুরুষকে ধরছি। তাহলে ঈশ্বর-প্রণিধান বলতে বোঝাচ্ছে— এই ঈশ্বরকে ধ্যেয় জ্ঞানে তাঁরই দিকে সমস্ত মানস-সত্তাকে ছুটিয়ে দেওয়া তাঁর সঙ্গে একীভূত হবার জন্যে। আর 'ধ্যান' বলতে অনুধ্যানকে বোঝাচ্ছে। সাধক যখন ভাবেন যে তাঁর ধ্যেয় তাঁর থেকে যেন দূরে সরে যেতে চাইছেন, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু, তাই সাধক কিছুতেই তাঁকে ছাড়ছে না, তাঁর পিছু ধাওয়া করে তাঁকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন— সাধকের মনের এই ভাবকে বলা হয় অনুধ্যান। প্রণিধান ও অনুধ্যান মিলে 'অভিধ্যান' বা ব্যাপক ধ্যান। এই অভিধ্যানে জীবমন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যেয়ের ভাবনায় ভাবিত হতে হতে একদিন ধ্যেয়েই রূপান্তরিত হয়, ভেদ-ভাবের সৃষ্টিকারিণী বিশ্বমায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জীবের অভেদজ্ঞানের উন্মেষ হয়। এর জন্যে লৌকিক বিদ্যাবুদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্তি, শাদা-কালোর ভেদ— কোন কিছুই ধর্তব্য নয়। যাগ-যজ্ঞ, জপ-তপ, বিধি-ভক্ত— কোন কিছুই কাজে আসে না। মানস-আধ্যাত্মিক সাধনায় মনের ভূমিকাটাই মুখ্য, বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোন স্থানে নেই এখানে। কাজেই গঙ্গাস্নান সেরে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরলেই অভেদ জ্ঞান লাগে না। ('যোগসাধনা' থেকে গৃহীত)

শ্রদ্ধার পরিবার, বিশেষত তার পিতা যদি মুখ না ফিরিয়ে নিতেন, হয়তো বিপদের সম্ভাবনা কিছুটা কমত

একটি হত্যাকাণ্ড এবং সমকালীন ভারতীয় সমাজ

মফস্‌সল ও ছোট শহরের মেয়েরা ঘরের গণ্ডি ছেড়ে বেরোচ্ছে এবং বেরোবেই। পরিবার যদি তাদের একটু বোঝার চেষ্টা করে, সবার জন্যই তা মঙ্গলজনক। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

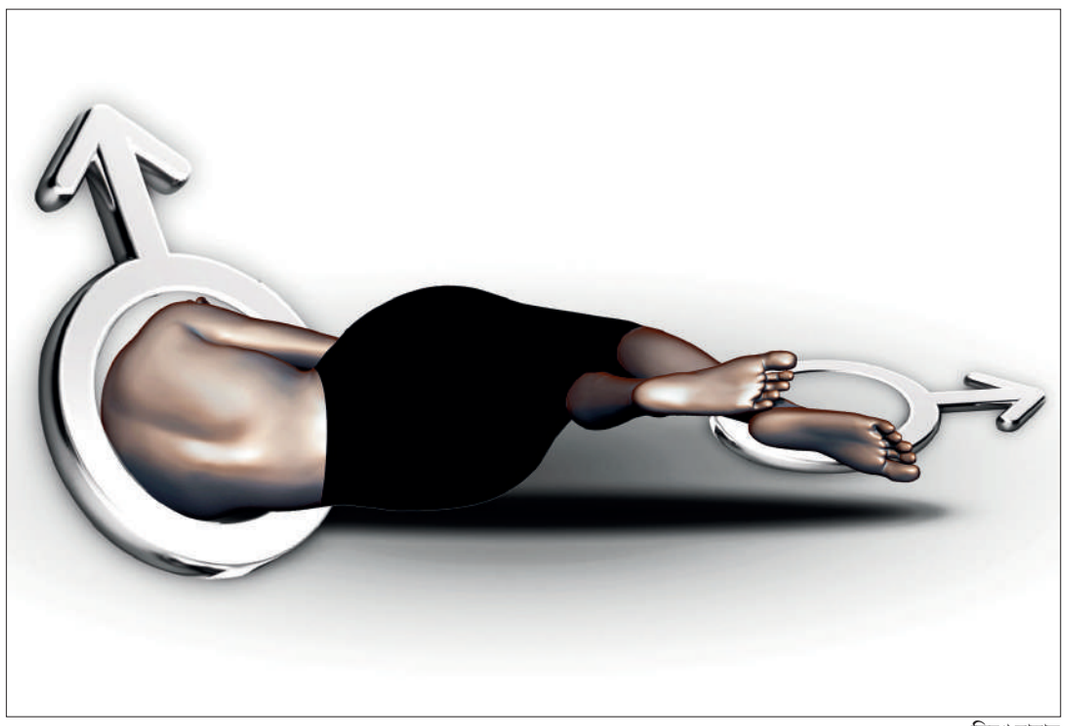

কিরণ মাডালু

আজ আমি ফুল পেয়েছি!/ আজ মাদারস ডে বা অন্য কোনও বিশেষ দিন নয়;/ গত রাতে ও আমাকে আবার মেরেছে, আর/ এবারে গত সব বারের থেকে বেশি করে মেরেছে;/ যদি ওকে ছেড়ে চলে যাই, কী করব?/ বাচ্চাগুলোর দেখভাল করব কি করে? কী করে টাকা পাব?/ আমি ওকে ভয় পাই, কিন্তু ওকে ছেড়ে যেতে তো আরও ভয় পাই এতটাই নির্ভর করি!/ কিন্তু ও নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছে;/ কারণ ও আজ আমাকে ফুল পাঠিয়েছে।

আজ আমি ফুল পেয়েছি!/ এটা একটা বিশেষ দিন— আমার শবযাত্রার;/ গত রাতে ও আমাকে মেরে ফেলেছে;/ আমি যদি ওকে ছেড়ে যাওয়ার সাহস আর শক্তিটুকু খুঁজে পেতাম;/ আমি হয়তো মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই পেতাম, কিন্তু আমি তো তাদের সহায়তা চাইনি;/ তাই আজ আমি ফুল পেয়েছি— শেষবারের মতো।

—পলেট কেলি

এই কবিতাটা (শুধু শেষাংশটুকু উদ্ধৃত) কবি পৃথিবীর সব মেয়ে, যারা ঘনিষ্ঠতম সঙ্গীর নিপীড়নের শিকার, সেই সব মেয়েদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। আশ্চর্যজনক ভাবে তা মিলে যাচ্ছে একত্রবাসের সঙ্গী প্রেমিক আফতাব পুনাওয়ালার হাতে নৃশংসভাবে নিহত শ্রদ্ধা ওয়ালকর-এর ঘটনার সঙ্গে। 'বাম্বল' ডেটিং অ্যাপে শ্রদ্ধার সঙ্গে আফতাব পুনাওয়ালার পরিচয়। দু'জনেই মফস্‌সলের বাসিন্দা, দু'জনেই এক ধরনের গান পছন্দ করে, দু'জনেই পাহাড়ে হাঁটতে পছন্দ করে, দু'জনেরই চোখে দারুণ কিছু করার স্বপ্ন যাতে প্রচুর রোজগার হবে, বিদেশে কাজ পাবে, ক্যানাডা কিংবা দুবাই— দু'জনেই বিদেশেই কোথাও বসতি করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে আফতাবের সম্পর্ক ধর্মের ভিন্নতার জন্যে মেনে নেয়নি শ্রদ্ধার পরিবার। আফতাবের পরিবার আপত্তি করেনি। এরা দু'জনেই মুম্বাইয়ের মফস্‌সল ভিরারের অধিবাসী। তাই তারা প্রথমে ভিরারেরই, ভাসাইতে জায়গা বদল করে করে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে শুরু করে।

সম্পর্কের শেকল

শ্রদ্ধার পরিবারের আপত্তিতে যখন তারা একত্রবাস শুরু করলো, প্রথম দিকে শ্রদ্ধা-আফতাবের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলোতে দারুণ উচ্ছ্বাস— আফতাব রান্না করতে খুব ভালোবাসে, নিজে হাতে রান্না করে শ্রদ্ধাকে খাইয়ে পর্যন্ত দেয়, রান্নার প্রচুর ছবি, দু'জনের পাহাড়ে হাঁটার ছবি। কিন্তু মুম্বইতে থাকতেই সম্পর্কে তাল কাটতে শুরু করেছে, শ্রদ্ধাকে মারধোর। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে হাসপাতালে দু'দিন চিকিৎসার জন্যে শ্রদ্ধাকে থাকতে হল, নিজের বিক্ষত শরীরের ছবি, কাজ কামাইয়ের কথা, সবটাই শ্রদ্ধা বন্ধুদের জানালো। এমনকী থানায় অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করল শ্রদ্ধা। কিন্তু আফতাবের মা-বাবা অনুরোধ করলেন বলে অভিযোগ তুলে নিল, থানায় জানাল সমস্যা মিটে গেছে, আফতাব ক্ষমা চেয়েছে। তবুও শ্রদ্ধা আফতাবের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যায়নি। অবশ্য বেরিয়ে যেতে চাইলেও পারত কিনা বলা কঠিন, কারণ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়ে মেয়েদের কম মূল্য দিতে হয়নি, বিশেষত আফতাবের সমস্ত আচরণ যখন অপরাধীর মতোই, মুম্বইতেই বেরিয়ে যেতে চাইলে শ্রদ্ধা যে সেখানেই নিহত হত কিনা জানা নেই। এ সব সত্ত্বেও আফতাবের সঙ্গে থাকা ছাড়া শ্রদ্ধা আর কোনও পথ খুঁজে পেল না।

একাকিত্বের যন্ত্রণা

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধার মা মারা গেলেন, বাড়িতে একমাত্র যাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধার কোনও যোগাযোগ ছিল। তাই শ্রদ্ধা নিজেকে ভীষণ একা মনে করে আফতাবকেই আঁকড়ে ধরল। মায়ের মৃত্যুর শোকে আফতাব সাহচর্য দিয়েছে, কিন্তু সে একা, তার কোনও বন্ধু নেই, কোনও আত্মীয় নেই, এ সব বলে মানসিক নির্যাতনও শুরু করেছে। এর সঙ্গে শারীরিক নির্যাতনও অব্যাহত, তবুও শ্রদ্ধা ছেড়ে যায়নি। বরং শ্রদ্ধা আবার একবার চেষ্টা করে, আফতাবের সঙ্গেই ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলোকে খুঁজতে যাওয়ার। তাই তারা হিমাচলে গেল, পাহাড়ে থেকে যদি আবার নিজেদের নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায়। সংবাদে প্রকাশ, পাহাড় থেকে তারা স্থির করে তাদের এই সম্পর্ক আর টিকবে না। তবে দিল্লিতে থাকার বিষয়ে শ্রদ্ধা মনস্থির করে ফেলেছে, বন্ধুরা জানিয়েছে সে অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছে এর মধ্যে, তার পর দিল্লি ফেরার মাত্র তিন দিনের মাথায় আফতাব শ্রদ্ধাকে নৃশংস ভাবে মারল। শ্রদ্ধার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টগুলো ব্যবহার করে, শ্রদ্ধা বেঁচে আছে কিন্তু নিরুদ্দেশ, প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে, শ্রদ্ধার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়েছে, হাতের আংটি খুলে 'বাম্বল'-এ পরিচিত অন্য বান্ধবীকে উপহার দিয়েছে, শ্রদ্ধার দেহাংশ ফ্রিজে রেখে ফ্ল্যাটে পার্টি দিয়েছে, ক্রমান্বয়ে বান্ধবী বদলেছে, তাতে আফতাবের অপরাধী চরিত্রটাই প্রমাণিত হয়। অথচ শ্রদ্ধা দিল্লিতে কাজ পেয়েছিল। আফতাব কোনও কাজে টিকতে পারছিল না, তার খাবার নিয়ে ভ্লগ 'হাংরিচক্র' একটু জনপ্রিয় হয়েছে, সে রান্নাতেই মন দিচ্ছে, কিন্তু এখনও সচ্ছলতা বহু দূর। তাই বিস্ময় লাগে যখন আফতাব বলে যে শ্রদ্ধা বিয়ের জন্য চাপাচাপি করেছিল বলে সে শ্রদ্ধাকে মেরেছে, কারণ তারা তো পথ আলাদা হয়ে গেছে বলে হিমাচল থেকে মন তৈরি করেই ফিরেছিল। তা হলে শ্রদ্ধা আফতাবের সঙ্গেই দিল্লিতে ফিরল কেন? কেন আফতাবের সঙ্গে এখনও থাকার কথা ভাবল? প্রশ্নগুলো থাকছেই, কারণ মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি কমছিল, সে জন্যেই আফতাব শ্রদ্ধাকে বার বার 'তোমার তো কেউ নেই' বলে একাকিত্ব বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

> মেয়েরা আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে, নিজের সব কিছু, এমনকী সব পাসওয়ার্ড ঘনিষ্ঠ মানুষটিকে দিয়ে দেওয়ার ভুল করলে অপরাধীরা তার সুযোগ নেবেই। মেয়েরাই বা কবে নিজেদের একটু দামি মনে করবে?

বিমুখ পরিবার

ছোটো শহরের মেয়েরাই এখন নতুন অর্থনীতির কর্মীদের এক বিরাট অংশ। তারা আজ মফস্‌সল থেকে এসে বড়ো শহরে নিজেদের মতো থাকছে, পছন্দমতো পোশাক পরছে, যখন ইচ্ছে খাচ্ছে, যা ইচ্ছে খাচ্ছে, রাত করে ফিরছে, জোরে জোরে গান শুনছে, অনেক রাত পর্যন্ত পার্টি করছে, নতুন নতুন বন্ধুত্ব করছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে একত্রবাস করছে, যে স্বাধীনতা সে তার নিজের পরিবারে, নিজের ছোট শহরে, পরিচিতের গণ্ডিতে পেত না। এবং এই সব কিছুর জন্যে সেই মেয়ে অনেক ঝুঁকিও নিচ্ছে। সেই মেয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ভুল করতেই পারে, এই কথা যদি পরিবার মেনে না নিয়ে সেই মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়, তা হলে সেই মেয়ের লাশ সনাক্ত করার মতো কাজের জন্যেও তো পরিবারকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

শ্রদ্ধার বাবা, যিনি সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন যে তাঁরা জাত বা ধর্মের বাইরে সম্পর্ক মেনে নেবেন না, আজ যখন মেয়ে নিরুদ্দেশ শুনে থানায় দৌড়োদৌড়ি শুরু করলেন, আর একটু আগে, আর একটু নমনীয়তা দেখালে হয়তো শ্রদ্ধা আজ বেঁচে থাকত। ভিন ধর্মের পুরুষের সঙ্গে ঘরের মেয়ের সম্পর্ক মেনে নেওয়ার প্রত্যাশা হয়তো অনেকের কাছেই একটু বেশিই দাবি। হয়তো মেনে নিলেও বেঁচে থাকত না শ্রদ্ধা, কারণ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেও মেয়েদের কম মূল্য দিতে হচ্ছে না, বিশেষত আফতাব যে রকম বুদ্ধিমান খুনি বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে, যে ভাবে শ্রদ্ধাকে আকৃষ্ট করে রাখতে পেরেছে এবং এখনও যে ভাবে তদন্তকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো অনেক পরিবার বিভ্রান্ত মেয়েটি 'পরিবারের এত অসম্মান করেছে যে ও ভুল বুঝে ফেরার থেকে মৃত্যুই ভালো' বলে মনে করে। সাধারণত পরিবারের পুরুষরাই এ রকম 'ভুল' করলে বেশি কঠোর অবস্থান নেয়, পরিবারের মেয়েরা একটু প্রশ্রয়ের চোখেই হয়তো দেখে, যেমন শ্রদ্ধারও একমাত্র মায়ের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পুরুষদের এই কঠোর অবস্থানের পরে এই দৌড়ঝাঁপ, এই বারবার আদালতে হাজিরা, গণমাধ্যমে নৃশংসতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, ডিএনএ পরীক্ষা -- এ সব কি তাঁদের মনে এই ভাবনাটা আনে না যে সময়ে মেয়েটির স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু নমনীয়তা দেখালে মেয়েটি হয়তো আজ বেঁচে থাকত? নাকি এই মৃত্যুকে তাঁরা শ্রেয়তর বলে মনে করেন? সে যে ভুল করেছে এবং নিজের জীবন দিয়ে সেই ভুলের দাম দিচ্ছে বলে প্রমাণিত, সেটাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন?

ভালোবাসার মাশুল

আজকের মেয়েরা, বিশেষ করে মফস্‌সলের, ছোট শহরের মেয়েরা, এগোবেই। তারা ঝুঁকি নেবে, ভুল করবে। পরিবার যদি একটু তাদের বোঝার চেষ্টা করে, তাদের ছোট জায়গার গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন জায়গায় যাওয়া, তাদের জীবনযাপন, তাদের বন্ধু এবং সঙ্গী চয়ন নিয়ে আলোচনার পথটা বন্ধ না করে, তা হলে তাদের পরিবার, এবং তার পুরুষেরা এই দৌড়ঝাঁপ আর এই মনোবেদনা আর গ্লানির অনুভূতি থেকে হয়তো বেঁচে যাবেন। অন্য দিকে কী করে শ্রদ্ধার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের নাগাল পেয়েছিল আফতাব যাতে সে শ্রদ্ধাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করার পরেও তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে শ্রদ্ধা যে নিরুদ্দেশ, আর ফিরবে না, এই কথা প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল? তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল? মেয়েরাও তাদের আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে, নিজের সব কিছু, এমনকী সোশ্যাল মিডিয়ার, ব্যাঙ্কের সব সব পাসওয়ার্ড ঘনিষ্ঠ মানুষটিকে দিয়ে দেওয়ার ভুল করলে অপরাধীরা তার সুযোগ নেবেই। মেয়েরাই বা কবে নিজেদের একটু দামি মনে করবে যাতে হিংসার আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জোরে খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে?

লেখক অর্থনীতির শিক্ষক ও সমাজকর্মী

কোন খেলা যে খেলবে কখন...

'স্পোর্টসওয়াশিং' অর্থাৎ খেলার আড়ালে রাষ্ট্রের কুকীর্তি লুকিয়ে রাখা বা ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা। মুসোলিনির ইতালি থেকে কাতার, একই পথের পথিক। লিখছেন **সৌরদীপ চট্টোপাধ্যায়**

একটা ব্যাপারে মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফার একটা দুর্দান্ত মিল। দু'জনেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই কথা বলে, 'আর যা-ই করো বাবা, রাজনীতিতে জড়িও না যেন!' মধ্যবিত্ত বাঙালি বাবা-মায়ের মতোই কাতার বিশ্বকাপের প্রাক্কালে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক চিঠিতে সমস্ত দলের কাছে আবেদন করেছিলেন, 'ফুটবলকে রাজনীতির মাঝে দয়া করে জড়াবেন না। আমরা ফিফায় সব মতকেই সম্মান করি, দুনিয়াকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই'। যদিও, কী ভাবে কাতারের মতো ছোট্ট একটি দেশ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেল, কী ভাবে কাতারকে বিশ্বকাপ দেওয়ার জন্য প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপের সূচিকে পালটে শীতকালে নিয়ে যাওয়া হল, কী ভাবে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করতে গিয়ে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-সহ একাধিক দেশ থেকে আসা দরিদ্র শ্রমিকদের নির্মম শোষণের দিকে ঠেলে দেওয়া হল—প্রশ্নগুলো সারা পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলেছে। অতএব, সমাধান একটাই, 'রাজনীতিকে জড়াবেন না!'

যদিও, ইতিহাস বাঙালি এবং ফিফা— দু'পক্ষের বক্তব্যেরই একশো আশি ডিগ্রি উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে। রাজনীতি এবং ক্রীড়াক্ষেত্র বারেবারেই একে অপরের সহায়ক বা বিরোধী হয়েছে এবং তা এতটাই যে, ইংরিজিতে একটা নতুন শব্দের জন্ম হয়েছে, 'স্পোর্টসওয়াশিং'। অর্থাৎ, খেলাধুলোকে হাতিয়ার করে নিজেদের কুকর্ম চাপার চেষ্টা করা। শব্দটা নতুন হলেও, তার প্রয়োগ বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে।

১৯৩৪ সালের ইতালি বিশ্বকাপ ছিল 'স্পোর্টসওয়াশিং'-এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তখন ইতালির মসনদে আসীন খোদ বেনিতো মুসোলিনি। তত দিনে ইতালি পালটে গিয়েছে একদলীয় পুলিশ রাষ্ট্রে। ফ্যাসিবাদ দেশের সর্বোচ্চ নীতি। প্রতিক্রিয়াও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, মুসোলিনির ওপর একাধিক হত্যার চেষ্টা হয়েছে। বিশ্বকাপের আয়োজন ছিল এই সব থেকে নজর ঘুরিয়ে ফ্যাসিস্ট দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ! তাকে কাজে লাগাতেও দ্বিধা করেননি মুসোলিনি। নিজেদের দলকে শক্তিশালী করতে ইতালি দলে অভিবাসীদের খেলারও সুযোগ করে দেন। ফলে ইতালির দলে আসেন আগে আর্জেন্তিনার হয়ে খেলা তারকা ফুটবলার লুই মন্তি, রেমুন্দো ওরসি। পাশাপাশি ছিলেন জিউসেপ্পে মেৎসার মত তারকারা। শোনা যায়, ফুটবলের বিন্দুমাত্র ভক্ত না হয়েও মুসোলিনি বিশ্বকাপকে এতটাই 'সিরিয়াসলি' নিয়ে নেন যে রোমে ইতালির প্রথম ম্যাচের আগে ফুটবলারদের চাঙ্গা করতে দলের শিবিরে গিয়ে বক্তৃতা করে এসেছিলেন! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ ইতালি জিতেছিল ৭-১ গোলে। ১৯৩৪ সালে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইতালি। চার বছর পরে, ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সেও একই রকম অপ্রতিরোধ্য চ্যাম্পিয়ন তারা।

মুসোলিনির 'সাফল্যে' উৎসাহিত হয়ে পরের বিশ্বকাপের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। ১৯৪২ সালের বিশ্বকাপের জন্য আবেদন করে নাৎসি জার্মানি। কিন্তু তার আগেই ১৯৩৯ সালের ৩১ আগস্ট মধ্যরাতে ফুয়েরার জারি করলেন 'ডাইরেক্টিভ নাম্বার ওয়ান ফর অপারেশন হোয়াইট'। জার্মান বাহিনী তীব্র আক্রমণ শুরু করল পোল্যান্ডে, শুরু হল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। আট বছর কোনও বিশ্বকাপ হয়নি।

তবে ফিফা বিশ্বকাপের সবচেয়ে কলঙ্কময় 'স্পোর্টসওয়াশিং' অধ্যায় নিঃসন্দেহে ১৯৭৮-এর আর্জেন্তিনা বিশ্বকাপ। মাত্র দুই বছর আগে, ১৯৭৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন সেনানায়ক জেনারেল হোর্হে রাফায়েল ভিদেলা। সংসদ বা 'কংগ্রেস' বন্ধ করে দেওয়া হয়, বিচারব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দেওয়া হয়, শুরু হয় নির্মম সামরিক শাসন। ভিদেলার কুখ্যাত পদ্ধতি ছিল— যাকে চলতি বাংলায় বলে, 'হাওয়া করে দেওয়া'। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেত, আর তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। তার পরেও বিশ্বকাপের দায়িত্ব আর্জেন্তিনাকেই দেওয়া হয়। জেনারেল ভিদেলাও বিশ্বকাপ আয়োজনকে নিজের সরকারের ভাবমূর্তি উদ্ধারের অপূর্ব সুযোগ হিসেবে নিয়েছিলেন। চোখধাঁধানো আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখেননি। এমনকী, শোনা যায়, নিজেদের দলকে জেতাতে এতটাই মরিয়া ছিলেন যে, পেরুর বিরুদ্ধে একটি 'নকআউট' ম্যাচের আগে পেরুর সরকারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বোঝাপড়া পর্যন্ত করা হয়েছিল। ম্যাচটি ৬-০ গোলে জেতে আর্জেন্তিনা। এই গল্পের সত্যতা কত দূর সেই নিয়ে খাঁটি খবর নেই, কিন্তু তার রেশ চলেছে বহুদিন। ২০১২ সালে পেরুর এক অশীতিপর সেনেটর এই অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছিলেন।

সে বার নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে ঘরের মাঠেই বিশ্বকাপ জেতে দানিয়েল পাসারেলা, মারিও কেম্পেস-এর আর্জেন্তিনা। জয়ের পর রাস্তায় উদ্বেল জনতার উৎসবের ঢল নেমেছিল। অথচ সেই স্টেডিয়াম থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে ছিল সামরিক সরকারের এক রহস্যময় 'ইস্কুলবাড়ি', আদতে যা ছিল বন্দিদের ওপর নির্যাতন চালানোর এক কুখ্যাত 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প'। কথিত আছে, স্টেডিয়াম থেকে ভেসে আসত দর্শকদের গর্জন, সঙ্গে মিশে যেত পাশের কারাগারে অত্যাচারিত কোনো বন্দির তীব্র আর্তনাদ! আজও আর্জেন্তিনার ইতিহাসে ঘুরে বেড়ায় সে সব হাড়হিমকরা গল্প।

উইকিমিডিয়া কমনস

১৯৩৪ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর ইতালির খেলোয়াড়দের জয়োল্লাস

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয়, বাণিজ্যসফল খেলাটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ 'সফট পাওয়ার' সঞ্চিত রয়েছে, তাতে আজ আর বিশেষ সন্দেহ নেই। ধনকুবের কাতার তাকেই কাজে লাগিয়েছে মাত্র। মাটির তলায় সঞ্চিত বিপুল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার বাদে বাস্তবিকই কাতার এক 'নেই রাজ্য', পারস্য উপসাগরের তীরে ছোট্ট এক মরুপ্রায় উপদ্বীপ। ফলে বিশ্বকাপকেই হাতিয়ার করে তারা নিজেদের জাহির করতে মরিয়া থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ঘটনা আজকের নয়, নতুনও নয়। বারেবারেই বিশ্বকাপ বা অলিম্পিক্স হয়ে ওঠে রাজনৈতিক হাতিয়ার, 'ভাবমূর্তি' উদ্ধারের সিঁড়ি। এ দিকে প্রকাশ্যে 'রাজনীতি করবেন না' বলে বারব